OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 76
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 680 - 689
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 680 - 689
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বিষ্ণুপুর ঘরানার উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য : একটি পর্যালোচনা

তানিয়া পাল
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ, বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ
গবেষক, রাজা নরেন্দ্রলাল খান ওমেন্স কলেজ
Email ID: tania@bankurachristiancollege.in
0009-0005-5940-0134

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Gharana, Bishnupur Gharana, Dhrupad, Malla Ruler, Rabindranath Tagore, Jaduvatta, Classical Music.

Abstract

The Bishnupur Gharana occupies a distinctive and significant position in the history of North Indian classical music in Bengal. This paper examines the origin, historical development, distinctive characteristics, and wider cultural significance of the Bishnupur Gharana from a historical perspective. Particular attention is given to the role of the Malla rulers of Bishnupur, whose sustained royal patronage provided an important institutional and cultural context for the development of this musical tradition. The influence of the North Indian Dhrupad tradition was particularly significant in shaping the musical practices of Bishnupur. The arrival of Ustad Bahadur Khan, traditionally regarded as a descendant of the celebrated musician Tansen, in the court of Raja Raghunath Singha II during the eighteenth century is generally regarded as an important phase in the historical development of the tradition. Through musical instruction and sustained royal patronage, a distinctive form of Dhrupad gradually developed within the socio-cultural milieu of Bishnupur.

The Bishnupur Gharana was further enriched and expanded by artists like Ramshankar Bhattacharya, Jadhunath Bhattacharya or Jaduvatta, Radhika Prasad Goswami, Gopeshwar Bandopadhyay and Gyanendra Prasad Goswami. The major characteristics of Bishnupur Gharana include a restrained alap, clear articulation of lyrics, distinctive style of ragas, major emphasis on devotional expression and a relatively simple and melodious style of performance in singing. It has a comparatively liberal approach to teaching and remains more open, along with the Guru-shishya parampara or tradition.

The tradition of Bishnupur Gharana went beyond its regional style and extended its influence in the broader cultural sphere. It has a significant connection with Kabi Guru Rabindranath Tagore through his music teacher Jadubhatta. The musical development of Rabindra Sangeet rooted in Bishnupur Gharana. A number of Rabindra Sangeet was influenced by the Dhrupad tradition of Bishnupur. Therefor the Bishnupur Gharana remains an

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 76
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 680 - 689
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

enduring historical legacy in the development of musical Heritage cultural identity and classical music tradition.

Discussion

হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীতের মেরুদণ্ড হল ঘরানা। এটি এমন একটি ঐতিহ্য যার মাধ্যমে সংগীত বিষয়ক জ্ঞান পরিবেশন শৈলী এবং শৈল্পিক মূল্যবোধ এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। একটি ঘরানা এমন এক স্বতন্ত্র সংগীত-সত্তাকে প্রতিনিধিত্ব করে - যা ইতিহাস সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিগত সৃজনশীলতার দ্বারা রূপায়িত। সময়ের পরিক্রমায় রাজকীয় ও সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতার ছায়ায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজস্ব সংগীতশৈলী বিকশিত হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ, কিছু নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল, নিজস্ব সঙ্গীতশৈলী ও পরিবেশনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে ওঠে - যা পরবর্তীতে ঘরানা নামে পরিচিতি লাভ করে। 'ঘরানা' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'গৃহ' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ হল 'বাড়ি' বা 'ঘর' বা 'পরিবার'। সাধারণ অর্থে যেমন একটি পরিবার বাবা-মা সন্তান এবং আত্মীয়দের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে, তেমনি সংগীতের ক্ষেত্রে ঘরানা একটি বৃহত্তর সংগীত পরিবারকে নির্দেশ করে। তবে এই পরিবার কেবল রক্ত সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এখানে গুরু শিষ্য ও প্রশিষ্যদের ধারাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই ঘরানার পরিধি অনেক বিস্তৃত। ঘরানার উৎপত্তি সাধারণত কোন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীকে কেন্দ্র করে হয়। সেই শিল্পীর নিজস্ব গায়েন রীতি, ভাব প্রকাশ ও সঙ্গীতচর্চার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে একটি স্বতন্ত্র ধারায় বা শৈলীতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে তার শিষ্য ও অনুসারীরা সেই ধারা অনুসরণ করে বিকাশ ঘটালে একটি ঘরানার প্রতিষ্ঠা ঘটে। যদিও কোন নির্দিষ্ট শৈলী এবং সেই শৈলীর অনুসরণকারীদের একটি পূর্ণাঙ্গ ঘরানা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে গেলে সেই শৈলীটিকে অবশ্যই অন্তত তিনটি প্রজন্ম ধরে বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হতে হয়। একটি ঘরানার সদস্যদের ওপর সেই বংশ পরম্পরার আদর্শ ও নীতিমালা অনুযায়ী সংগীত চর্চার একটি নির্দিষ্ট মানদন্ড বজায় রাখার গুরুদায়িত্ব থাকে। কণ্ঠসঙ্গীত এবং যন্ত্রসংগীত উভয় ধারার ক্ষেত্রে ঘরানা ব্যবস্থার অস্তিত্ব রয়েছে। যে অঞ্চলে এই সংগীত ধারা বা শৈলী বিকশিত হয়, সাধারণত সেই অঞ্চলের নাম অনুসারেই ঘরানার প্রধান পরিচয় নির্ধারিত হয়। ঘরানার অপর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ধারাবাহিকতা। এটি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে গুরু শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে সংরক্ষিত ও পরিবাহিত হয়। যদিও ঘরানা কেবল অনুকরণের উপর নির্ভরশীল নয়। প্রাচীন রীতিনীতির সংরক্ষণ বজায় রেখে পরবর্তী সাধকরা নতুন নতুন উপাদান সংযোজন করে ঘরানাকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করে। বহু প্রজন্মের সাধনা, অনুশীলন ও শিল্পচর্চার মাধ্যমে এটি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একসময় বিশেষ মর্যাদা অর্জন করে। এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি ঘরানা তার স্বকীয়তা ও কৌলিন্য লাভ করে। রাজদরবারে পৃষ্ঠপোষকতা যখন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল, সেই সময় সংগীতশিল্পীরা নিজেদের বংশপরম্পরার উপর জোর দিয়ে নিজেদের শৈল্পিক কৃতিত্ব ও মর্যাদা অটুট রাখার একটি মাধ্যম হিসেবেই এই ঘরানা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন।[১]

বাংলায় ধ্রুপদ[২] সংগীতের সূচনা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে। বিষ্ণুপুর তার আদি কেন্দ্র হিসেবে প্রসার লাভ করে। মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শিল্প ও সংগীতের প্রতি প্রবল অনীহার কারণে তাঁর শাসনাধীন এলাকায় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গীতজ্ঞরা দিল্লি ছেড়ে অন্যান্য জায়গায় পদার্পণ করেছিলেন এই সময়। যার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প ও সংস্কৃতির আঞ্চলিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিষ্ণুপুর রাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহদেব সম্রাটের কঠোর বিধিনিষেধের মুখেও বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে এই সময় দিল্লি থেকে তানসেনের বংশধর ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ সাহেব ও প্রখ্যাত মৃদঙ্গী বা পাখোয়াজ বাদক পীরবক্সকে মাসিক ৫০০ টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন। জন্ম সূত্রে বাহাদুর খাঁ ছিলেন তানসেনের বংশের অষ্টম পুরুষ। বিষ্ণুপুরে আসার পর বাহাদুর খাঁ রাজদরবারের সভা গায়কের পদ অলংকৃত করেন। রাজা তাকে একটি এলাকা প্রদান করেন এবং প্রবাদপ্রতিম শিল্পীর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এলাকাটির নামকরণ করেন বাহাদুরগঞ্জ। কালের স্রোতে রাজা ও রাজ দরবার বিলীন হয়ে গেলেও ওস্তাদজির স্মৃতিবিজড়িত স্থানটি আজও ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে বিদ্যমান।[৩]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 76
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 680 - 689
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাহাদুর খাঁ সাহেবের মত আরো অনেক প্রখ্যাত শিল্পী দিল্লি ত্যাগ করে বাংলার বিভিন্ন স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ওস্তাদ মান খাঁ, ওস্তাদ রসুল বক্স, হায়দার খাঁ, ওস্তাদ বড়ে মিয়া, হসসু খাঁ প্রমুখ। ওস্তাদ মান খাঁ ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে চুঁচুড়ায় বসবাস শুরু করেন। ওস্তাদ রসুল বক্স প্রথমে কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে এবং পরবর্তীকালে হুগলি শ্রীরামপুরে অবস্থান করেন এবং হায়দার খাঁ বেতিয়াতে সঙ্গীতচর্চা শুরু করেন। এই শিল্পীদের নিরলস সংগীত সাধনা ও শিক্ষাদানের ফলে চুঁচুড়া, কৃষ্ণনগর, শ্রীরামপুর, মুর্শিদাবাদ, বেতিয়া, মেটিয়াবুরুজ প্রভৃতি অঞ্চল ধ্রুপদ সংগীতের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। সংগীতের এই ধারাকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন সংগীত প্রতিভার বিকাশ ঘটে। ওস্তাদ মান খাঁর শিষ্যদের মধ্যে রামচন্দ্র শীল, গোপালচন্দ্র পাঠক, পরান মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পাল এবং রামকানাই মুখোপাধ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে রামদাস গোস্বামী সংগীত শিক্ষা লাভ করেন ওস্তাদ রসুল বক্সের কাছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ধ্রুপদ সংগীতের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল। যদিও কালানুক্রমিক বিচারে বিষ্ণুপুরই অগ্রগণ্য। ওস্তাদ মান খাঁ ১৮০৬ সালে চুঁচুড়া এলেও বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে। সুতরাং প্রাচীনতা এবং ঐতিহ্যের নিরিখে বিষ্ণুপুর-ই বাংলার শাস্ত্রীয় সংগীতের আদি পীঠস্থান হিসেবে স্বীকৃত।

এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হল বিষ্ণুপুর ঘরানার উদ্ভব ও বিকাশকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা। বিশেষভাবে মল্লরাজাদের সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতা, মুঘল যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি এবং উত্তর ভারতীয় ধ্রুপদ সংগীতের প্রভাব কীভাবে বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে ভূমিকা পালন করেছিল তা অনুসন্ধান করা এই গবেষণার লক্ষ্য। এছাড়াও বিষ্ণুপুর ঘরানার সংগীত বৈশিষ্ট্য, গুরু-শিষ্য পরম্পরা এবং বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এর গুরুত্ব নিরূপণ করাও এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই গবেষণায় মূলত ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থ, গবেষণাপত্র, সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক দলিল এবং প্রাসঙ্গিক সাহিত্য ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি বিষ্ণুপুর ঘরানার উৎপত্তি, বিকাশ এবং সংগীতচর্চা সম্পর্কিত তথ্যসমূহ তুলনামূলক ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে বিষয়টির ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিষ্ণুপুর ঘরানার সূত্রপাত : এই ঘরানাটির উৎপত্তি ঘটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুরে। যদিও এর মূল শিকড় প্রোথিত রয়েছে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে মল্লরাজ রাজমল্লের সময় থেকে বিষ্ণুপুরের সংগীত চর্চার সূত্রপাত ঘটে। আবার কেউ কেউ মনে করেন খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের মল্ল রাজবংশের ৪২ তম রাজা পৃথ্বিমল্লর রাজত্বকালে এখানে সঙ্গীত চর্চার শুরু হয়। কারো কারো মতে মহারাজা শিব সিংহ দেবের রাজত্বকালই বিষ্ণুপুরি সংগীতের শুরু। প্রধানত সাম গান, মন্ত্র, স্তোত্র, পাঁচালী গীতগোবিন্দের প্রবন্ধ সংগীত ইত্যাদির অনুশীলনে ওই পর্যায়ে সংগীত চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল ছিল বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে এক সুবর্ণ যুগ। তাঁর সময়েই শ্রীনিবাস আচার্য বিষ্ণুপুরে আসেন। তার প্রভাবে মহারাজা বীর হাম্বির বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন এবং যথারীতি বিষ্ণুপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলে কীর্তন গান প্রসার লাভ করে। বীর হাম্বির নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং বেশ কিছু কীর্তনের পদও রচনা করেছিলেন। এই সময়ের সংগীত চর্চার মধ্যে কোন বিধিসম্মত শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চার অনুশীলন ছিল না। বরং কীর্তন, বাউল, ভাদু, তুসু, ঝুমুর, কথকথা, তরজা, পাঁচালী, কৃষ্ণ যাত্রা, খেউর শ্রেণীর সংগীতের চর্চা ও অনুশীলনী ছিল তৎকালীন বিষ্ণুপুরের গান বাজনার রেওয়াজ।[৪]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক ও মধ্যবর্তী সময়ে, যখন কলকাতার মতো নগর কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন 'ঘরানা'-র সংগীত শৈলীগুলো ধীরে ধীরে একে অপরের সাথে মিশে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়েই বিষ্ণুপুরের সংগীত শিল্পীদের মাঝে 'ধ্রুপদ'[৫] সংগীতশৈলীটি পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছিল। ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় যে, বিষ্ণুপুরের মহারাজ বীরহাম্বীর ছিলেন মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমসাময়িক। আর সেই সময়েই 'সেনিয় ঘরানা' তার পূর্ণ গৌরবে ও খ্যাতির শিখরে অবস্থান করছিল। এর খ্যাতি সমগ্র ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিষ্ণুপুরের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 76
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 680 - 689
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সঙ্গীতের ওপর এর প্রভাব ছিল অপরিসীম। ঠিক এই সময়েই সেনিয় ঘরানার বিখ্যাত ধ্রুপদ শিল্পী তানসেনের বংশধর বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরে আসেন[৬] এবং তাঁর ঘরানাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। বিষ্ণুপুরের পরবর্তী মহারাজা, রঘুনাথ সিংহ দেব (দ্বিতীয়), বাহাদুর খাঁকে জনপ্রিয় করে তোলার দিকে তাঁর মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। এই সময়েই ওস্তাদ বিষ্ণুপুরে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং মহারাজা তাঁকে তাঁর রাজসভার গায়ক হিসেবে সম্মানিত করার জন্য সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেন। মহারাজা ঘোষণা করেন যে, যার কণ্ঠস্বর সুমধুর এবং সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ রয়েছে, এমন যে-কেউ ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর কাছে কোনো প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। তিনি দরিদ্র শিক্ষার্থীদের আর্থিক দায়ভারও বহন করেছিলেন। সময়ের ব্যবধানে, বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী বাহাদুর খানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বাহাদুর খাঁ সাহেবই হলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার আদি গুরু। অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে রাজা রঘুনাথ সিংহই বাহাদুর খাঁকে দিল্লি থেকে নিয়ে এসেছিলেন কিনা! ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ স্বয়ং রাজা রঘুনাথের উদ্দেশ্যে একটি গান রচনা করেছিলেন। সাহানা রাগে চৈতালে নিবদ্ধ বিখ্যাত সেই ধ্রুপদটি হল -

"সবগুণ নিধান মহারাজ রঘুনাথ
তু অ দরবার সায়ত শোহাবে।
অনেক গুণীজন চহঁচক সে আয়ে
ঔর সব অযাচক পদ পাবে।।"[৭]
"তুঁহি দাতা বীর, সবকো কর বেপীর
বিক্রমসে দূরজন সব দূর জাবে।
তুঅ সম রাজ জগমে নহি দুজো -
ইস্ লিয়ে বহাদুর নিশদিন গুন গাবে।।"[৮]

বিষ্ণুপুর ঘরানার উত্তরাধিকারী শিল্পীগণ : ওস্তাদ বাহাদুর খানের উত্তরসূরি হিসেবে গদাধর চক্রবর্তী বিষ্ণুপুরের রাজদরবারে সভাগায়কের পদ অলঙ্কৃত করেন। বিষ্ণুপুর ঘরানার বিকাশে তাঁর পারিবারিক অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তাঁর বংশোদ্ভূত বহু শিল্পী এই ধারার চর্চাকে বলীয়ান করেছিলেন। এই বংশেরই অন্যতম সুযোগ্য প্রতিনিধি ছিলেন অনন্তলাল চক্রবর্তী, যিনি পরবর্তীকালে কলকাতার শোভাবাজারের মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রাজদরবারে সঙ্গীতশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। এই সংযোগটি বিষ্ণুপুর ঘরানার আঞ্চলিক পরিধি অতিক্রম করে কলকাতার নাগরিক অভিজাত শ্রেণীতে বিস্তৃত হওয়ার আদি পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

১৭৬১ সালে বিষ্ণুপুরের মল্লেশ্বর কড়াকুলিতে জন্মগ্রহণ করেন রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। তাঁর পৈতৃক আদি নিবাস ছিল তৎকালীন রাজশাহীতে, কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষগণ বিষ্ণুপুরে এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। মল্লরাজ চৈতন্য সিংহের রাজত্বকালে রামশঙ্করের পিতা গদাধর ভট্টাচার্য রাজসভার প্রধান পন্ডিত বা 'রাজপন্ডিত' ছিলেন। পারিবারিক পরিমণ্ডলে রামশঙ্কর শাস্ত্রীয় সংস্কৃতে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করলেও, স্বকীয় মজ্জাগত প্রতিভার টানে তিনি ব্যাকরণ-চর্চা ত্যাগ করে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে তিনি রাজা চৈতন্য সিংহের রাজসভার প্রধান সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। বিষ্ণুপুর ঘরানার ইতিহাসে রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের অবদান যুগান্তকারী হওয়ার মূল কারণ দুটি –

১. **সঙ্গীত শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ :** তিনি স্বগৃহে একটি অবৈতনিক সঙ্গীত শিক্ষালয় স্থাপন করেন, যা সনাতন অনুদার গুরু-শিষ্য পরম্পরার কঠোর গোপনীয়তা ভেঙে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়।

২. **বাংলা ধ্রুপদের প্রবর্তন :** তিনিই প্রথম সঙ্গীতজ্ঞ যিনি ব্রজবুলি বা হিন্দির পরিবর্তে বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ পদ রচনা করেন। তাঁর রচিত একটি কালজয়ী সৃষ্টি -

"অজ্ঞান-তম-নিকরে গরিমাময়ী পতিত
জ্ঞান কিঞ্চিৎ বিতর জগদম্বে।"[৯]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 76
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 680 - 689
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সঙ্গীতের পাশাপাশি সাহিত্য ও শাস্ত্রচর্চাতেও তাঁর অবদান ছিল। তিনি মহাভারতের 'বিরাট পর্ব' ও 'বন পর্ব'-এর ওপর পুঁথি রচনা করেছিলেন। ১৮৫৩ সালে এই মহান আচার্যের জীবনাবসান ঘটে। তাঁর সুযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ ভট্টাচার্য (যদুভট্ট) এবং দীনবন্ধু গোস্বামী অন্যতম, যাঁরা প্রত্যেকেই বাংলার সঙ্গীত ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করেছিলেন।

বিষ্ণুপুর ঘরানার সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ও কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন যদুনাথ ভট্টাচার্য,[১০] যিনি আপামর ভারতবাসীর কাছে 'যদুভট্ট' বা 'যদুভট্টাচার্য' নামে সমধিক পরিচিত। ১৮৪০ সালে বিষ্ণুপুরে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা মধুসূদন ভট্টাচার্য ছিলেন রাজা নীলমণি সিংহের দরবারী গায়ক। মাত্র দশ বছর বয়সে যদুভট্ট পণ্ডিত রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের অধীনে প্রথাগত তালিম শুরু করেন। ১৮৫৩ সালে গুরুর প্রয়াণের পর, তিনি ১৮৫৫ সালে কলকাতায় আসেন এবং গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ধ্রুপদী সঙ্গীতের উচ্চতর পাঠ গ্রহণ করেন। যদুভট্টের সঙ্গীত প্রতিভা সমকালীন ভারতের একাধিক রাজদরবারকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি পর্যায়ক্রমে কুচিয়াকোল, পঞ্চকোট এবং ত্রিপুরার রাজদরবারে সভাগায়কের মর্যাদা লাভ করেন। গুণমুগ্ধ পঞ্চকোটরাজ তাঁকে 'রঙ্গনাথ' এবং ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁকে 'তানরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ত্রিপুরা রাজদরবারে তাঁর অলৌকিক শ্রুতিধরত্ব ও সৃজনশীলতার একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়। দরবারে আগত এক বহিরাগত ওস্তাদ 'নটনারায়ণ' রাগে গান গেয়ে যদুভট্টকে প্রত্যুত্তর দেওয়ার আহ্বান জানান। রাগটি সম্পর্কে পূর্বে কোনো ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও, যদুভট্ট গভীর মনোযোগের সাথে ওস্তাদের পরিবেশনাটি শুনেই রাগটির চলন ও সূক্ষ্ম শ্রুতিপ্রয়োগ আত্মস্থ করেন। মাত্র এক রাতের ব্যবধানে তিনি স্বয়ং নটনারায়ণ রাগে সম্পূর্ণ নতুন একটি বন্দিশ রচনা করে পরদিন রাজসভায় পরিবেশন করেন - যা সমকালীন সঙ্গীতসমাজে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।[১১]

বাঙালির মনন গঠনে যদুভট্টের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল যদুভট্টের কাছে সঙ্গীতের পাঠ নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকদের একাংশের মতে, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে যদুভট্টই সর্বপ্রথম 'বন্দে মাতরম' স্তোত্রটিতে সুর আরোপ করেছিলেন। তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীতশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রবীন্দ্রনাথের আদি ও মধ্য পর্বের বহু ধ্রুপদ গানে এবং ভাঙা গানের সুরে যদুভট্টের গায়নশৈলী ও কাঠামোগত প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।[১২] তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবেও সঙ্গীত প্রসারে ব্রতী ছিলেন। ১৮৮৩ সালে, মাত্র ৪৩ বছর বয়সে এই প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীতমনীষীর অকালপ্রয়াণ ঘটে। যা বিষ্ণুপুর ঘরানা তথা ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে একটি অপূরণীয় ক্ষতি।

পণ্ডিত রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের শিষ্যপরম্পরায় অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাম কেশবলাল চক্রবর্তী। উনিশ শতকে যখন বিষ্ণুপুরের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা হ্রাস পাচ্ছিল, তখন কেশবলাল কলকাতার উদীয়মান ধনী ও অভিজাত সমাজ বিশেষত তারকনাথ প্রামাণিকের মতো ধনকুবেরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। এই রূপান্তরটি বিষ্ণুপুর ঘরানার টিকে থাকার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

অন্য দিকে, এই পর্বের অন্যতম বহুমাত্রিক সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বিষ্ণুপুর ঘরানার কণ্ঠসঙ্গীতের ঐতিহ্যকে যন্ত্রসঙ্গীতে সার্থকভাবে রূপান্তরিত করেন। তিনি একাধারে বীণা, সুরবাহার, এসরাজের মতো তন্ত্রীযন্ত্র এবং অবনদ্ধ বাদ্য হিসেবে মৃদঙ্গ বাদনে সমভাবে পারদর্শী ছিলেন। ঘরানার বহুমুখীনতা ও শাস্ত্রীয় কাঠামোর বিস্তারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

১৮৫২ সালে বিষ্ণুপুরে জন্মগ্রহণ করেন রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী। তাঁর পিতা জগৎচাঁদ গোস্বামী ছিলেন একজন প্রখ্যাত মৃদঙ্গবাদক, যার ফলে শৈশব থেকেই তিনি এক সাঙ্গীতিক পরিবেশ লাভ করেন। রাধিকা প্রসাদ বিষ্ণুপুর ঘরানার শীর্ষস্থানীয় তিন আচার্য — অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু গোস্বামী এবং যদুনাথ ভট্টাচার্যের (যদুভট্ট) কাছে ধ্রুপদী সঙ্গীতের পাঠ নিয়েছিলেন। রাধিকা প্রসাদ ধ্রুপদ ছাড়াও খেয়াল, ঠুমরি, টপ্পা এবং রাগপ্রধান গানের ক্ষেত্রেও অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর কর্মজীবন ছিল বর্ণময়। প্রথমে তিনি বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজদরবারের সভাগায়ক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি বহরমপুরের কাশিমবাজার রাজবাড়িতে রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রধান

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 76
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 680 - 689
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সভাসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে যোগ দেন। রাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রয়াণের পর, তিনি কলকাতার সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়িতে (মহারাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বংশধারা) চলে আসেন। পাথুরিয়াঘাটায় অবস্থানকালেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রাধিকা প্রসাদের সাক্ষাৎ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-ভাবনা ও ব্যক্তিত্বের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে তিনি শান্তিনিকেতনে সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। বিশ্বভারতীর আদি পর্বের সঙ্গীত বিভাগের ভিত গঠনে তিনি উজ্জ্বল ভূমিকা রাখেন। রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী এক বিশাল ও প্রভাবশালী শিষ্যমণ্ডলী তৈরি করেছিলেন। এনারাই বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য - জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী (বিখ্যাত খেয়াল ও ধ্রুপদ গায়ক), গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী (যিনি পরবর্তীকালে কলকাতায় বহু বিখ্যাত শিষ্যের জন্ম দেন), মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতকড়ি মালাকার এবং নাটোরের জমিদার যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়। ১৯২৫ সালে এই মহান সঙ্গীতমনীষীর জীবনাবসান ঘটে।

বিষ্ণুপুর ঘরানার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বদের অন্যতম হলেন সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৭৯ সালে বিষ্ণুপুরে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের অন্যতম প্রধান শিষ্য ও ঘরানার প্রবাদপ্রতীম আচার্য। প্রথম জীবনে গোপেশ্বরের প্রবল অনুরাগ ছিল চিত্রকলার প্রতি। তবে পুত্রের সঙ্গীত প্রতিভা অনুধাবন করে পিতা অনন্তলালই তাঁকে সঙ্গীতকে পেশা হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেন এবং তিনি স্বয়ং সংগীতের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করেন। ঘরানার গায়নরীতিকে আরও সমৃদ্ধ ও উদার করতে অনন্তলাল অত্যন্ত অল্প বয়সেই গোপেশ্বরকে কলকাতায় পাঠান। কলকাতায় তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ওস্তাদদের সান্নিধ্যে আসেন। শিবনারায়ণ মিশ্রের কাছে ধ্রুপদের উচ্চতর শিক্ষা নেন। গুরুপ্রসাদ মিশ্র এবং প্রখ্যাত মনোহর চক্রবর্তীর (মতান্তরে গোপাল চক্রবর্তী বা 'নুলো গোপাল') কাছে খেয়াল ও টপ্পা অঙ্গের নিপুণ পাঠ গ্রহণ করেন। এর ফলে বিষ্ণুপুরের সনাতন ধ্রুপদ শৈলীর সঙ্গে উত্তর ভারতীয় খেয়াল ও লখনউ-বেনারসের টপ্পা অঙ্গের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটে গোপেশ্বরের গায়কীতে।

কলকাতার শিক্ষা সমাপ্তির পর গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমানের মহারাজাধিরাজের রাজ-সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৮৯৫ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ দুই দশক তিনি বর্ধমান রাজদরবারে অতিবাহিত করেন। এই সময়টি ছিল তাঁর সাঙ্গীতিক জীবনের স্বর্ণযুগ। এখানে অবস্থানকালে তিনি সমকালীন ভারতের বহু লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ওস্তাদ ও সঙ্গীতগুণীদের সংস্পর্শে আসেন, যা তাঁর সঙ্গীততাত্ত্বিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। সমকালীন গুণীজনদের সংস্পর্শে এসে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় উপলব্ধি করেন যে, কেবল ব্যবহারিক সংগীতচর্চাই একজন শিল্পীর জন্য যথেষ্ট নয়, বরং সংগীতের ইতিহাস ও তত্ত্বের ওপর সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই তাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসা থেকে তিনি নিজেকে সঙ্গীত-ইতিহাসের গবেষণায় নিয়োজিত করেন। এই ক্ষেত্রে তিনি পণ্ডিত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এবং রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত-গবেষণা ও পদ্ধতি দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ও সহায়তাপ্রাপ্ত হন। এক ঐতিহাসিক শাস্ত্রীয় বিতর্কে সঙ্গীততত্ত্ব ও ইতিহাসের অকাট্য যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে তিনি সমকালীন দুজন প্রথিতযশা ওস্তাদকে পরাজিত করেন। তাঁর এই তাত্ত্বিক পাণ্ডিত্যে প্রীত হয়ে বর্ধমানের মহারাজা তাঁকে 'সঙ্গীত নায়ক' উপাধিতে ভূষিত করেন। সঙ্গীতের মূল উৎস ও ইতিহাসকে আকর গ্রন্থ থেকে উদ্ধার করার লক্ষ্যে তিনি নিষ্ঠার সাথে হিন্দি, সংস্কৃত এবং ফারসি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় যন্ত্রসংগীতেও একজন দক্ষ শিল্পী ছিলেন। তিনি সুরবাহার, সেতার, এসরাজ, পাখোয়াজ এবং তবলা বাজাতে পারতেন। এছাড়া তিনি 'ন্যাস-তরঙ্গ' বাদনেও পারদর্শী ছিলেন।[১৩]

বাঙালির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান সর্বাগ্রগণ্য। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমে 'সঙ্গীত' একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে, যা পরবর্তীতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরেও সম্প্রসারিত হয়। এই পর্বেই তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরীর পত্নী লেডি প্রতিভা চৌধুরী পরিচালিত বিখ্যাত 'সঙ্গীত সংঘ'-এর অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। একজন আদর্শ শিক্ষাবিদ হিসেবে মেধা নির্বিশেষে সাধারণ ও অনুসন্ধিৎসু— উভয় স্তরের শিক্ষার্থীদের কাছে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে সহজলভ্য ও জনপ্রিয় করে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের মূল ব্রত। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সঙ্গীত শিক্ষা ও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 76
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 680 - 689
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ইতিহাসকে নথিবদ্ধ করতে তিনি বহু আকর গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত হল— 'সংগীত চন্দ্রিকা'-র দুটি খণ্ড, 'গীতমালা', 'তানমালা', 'সংগীত লহরী', 'ভারতীয় সংগীত ইতিহাস'-এর দুটি খণ্ড এবং আরও অনেক গ্রন্থ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর গভীর আত্মিক ও সাঙ্গীতিক সম্পর্ক ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'সঙ্গীত প্রবেশিকা'-য় তিনি নিয়মিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতেন। পরবর্তীতে তিনি বিখ্যাত 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা' পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্বও সফলভাবে পালন করেন। ১৯১৯ এবং ১৯২৪ সালে তিনি 'সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলন'-এ সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে আমন্ত্রিত হন। ১৯২৪ সালের সম্মেলনে গঠিত একটি উচ্চপর্যায়ের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত হন তিনি, যার মূল কাজ ছিল সমগ্র ভারতের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সঙ্গীতের মানদণ্ড নির্ধারণ ও অভিন্ন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলে তিনি কলকাতা ত্যাগ করে স্বভূমি বিষ্ণুপুরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে একটি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বভারতীর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'সুর-সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি বিশ্বভারতীর অতিথি অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৬১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক সম্মাননা 'দেশিকোত্তম'[১৪] উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬৩ সালে এই যুগস্রষ্টা মহাজীবনের অবসান ঘটে।

বিষ্ণুপুর ঘরানার বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের অন্যতম প্রবাদপ্রতিম কণ্ঠশিল্পী ছিলেন আচার্য জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী (১৯০২–১৯৪৫)। তাঁর সঙ্গীত জীবন শুরু হয় পিতা বিপিন চন্দ্র গোস্বামীর নির্দেশনায় পারিবারিক পরিমণ্ডলে। পরবর্তীতে তিনি তাঁর কাকা, ঘরানার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ পণ্ডিত রাধিকা প্রসাদ গোস্বামীর কাছে উচ্চতর ও কঠোর শাস্ত্রীয় তালিম গ্রহণ করেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরি এবং টপ্পা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এই চারটি প্রধান ধারাতেই তাঁর সমান ও অনায়াস দক্ষতা ছিল। জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী তাঁর শিক্ষাদানে মানবিকতা ও সাম্যবাদের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে নলিন চন্দ্র মালাকার ছিলেন প্রান্তিক নিম্নবর্গের প্রতিনিধি এবং দেবপ্রসাদ গর্গ ছিলেন মহিষাদলের জমিদার বংশের সন্তান। কিন্তু আভিজাত্য বা জাতিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি উভয়কে সমমর্যাদায় সঙ্গীত শিক্ষা দান করেন। তাঁর অন্য এক প্রখ্যাত শিষ্য ছিলেন বাঁকুড়ার ওঙ্কারনাথ চট্টোপাধ্যায়। জাতীয় স্তরে প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি দীর্ঘকাল কলকাতায় অবস্থান করেন এবং প্রখ্যাত 'গ্রামোফোন কোম্পানি'-র সুরকার ও পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। এই সূত্রেই জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে তাঁর গভীর সখ্য গড়ে ওঠে এবং তিনি বহু কালজয়ী নজরুলগীতির সুরারোপ ও রেকর্ড করেন। ১৯৩৮ সালের পর এক গভীর মানসিক রূপান্তরের কারণে তিনি কলকাতার নাগরিক জীবন ত্যাগ করে বিষ্ণুপুরে ফিরে আসেন এবং ১৯৪৫ সালে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

বিংশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুর ঘরানার কণ্ঠসঙ্গীতের গাম্ভীর্য ও অলঙ্করণকে সেতারের তারে সফলভাবে প্রতিস্থাপিত করার ক্ষেত্রে পণ্ডিত গোকুলচন্দ্র নাগ ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত মণিলাল নাগের অবদান ঐতিহাসিক। ১৯০৬ সালে বাঁকুড়ার রামপুরে জন্মগ্রহণ করেন গোকুলচন্দ্র নাগ। তিনি ঘরানার বিশিষ্ট গুণী রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সেতার বাদনের নিবিড় শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি প্রখ্যাত কোরিওগ্রাফার উদয়শঙ্করের বিশ্বখ্যাত নৃত্যদলের প্রধান যন্ত্রশিল্পী হিসেবে ভারত ও বিশ্বভ্রমণ করেন। পণ্ডিত গোকুলচন্দ্র নাগ সমকালীন সঙ্গীত জগতের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব পণ্ডিত রবিশঙ্করকে সেতার বাদনের বহু সূক্ষ্ম ও জটিল কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি কলকাতার 'মিউজিক একাডেমি'-তে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে অবনীমোহন দোলুই, তাপস মিত্র এবং আন্তর্জাতিক গবেষক-শিল্পী ইরা ল্যান্ডগার্টেন অন্যতম। ১৯৮৩ সালে তিনি প্রয়াত হন।

পণ্ডিত মণিলাল নাগ ১৯৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিষ্ণুপুর ঘরানার একজন বিশেষজ্ঞ শিল্পী ছিলেন। সেতার বাদনেও তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা গোকুল নাগের কাছে সেতার বাদন শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে 'অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স'-এর মাধ্যমে তিনি তাঁর সঙ্গীতজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি ভারতের বিশাল অংশ জুড়ে এবং বিদেশে (যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে) সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। ২০০১ সালে তিনি 'সঙ্গীত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 76
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 680 - 689
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নাটক একাডেমি পুরস্কার' লাভ করেন। এছাড়াও তিনি বহু সম্মাননা ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ২০২০ সালে তাঁকে 'পদ্মশ্রী'[১৫] পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

এই ঘরানার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ফলে এর শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং বিবর্তনের ধারায় এক অসাধারণ উদারতা ও মুক্তচিন্তার উন্মেষ ঘটেছে। এই ঘরানায় এমন অনেক রাগের চর্চা হয়, যাদের নাম বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও তাদের স্বরবিন্যাস (স্বর) এবং চলন (রাগের গতিপথ) প্রচলিত ধারার চেয়ে ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, এই ঘরানার 'পূর্বী', 'সোহিনী', 'শ্যাম', 'বিভাস' এবং আরও অসংখ্য জনপ্রিয় নামের রাগের স্বর ও চলন স্বতন্ত্র প্রকৃতির। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গানে যে 'সোহিনী', 'পূর্বী', 'বিভাস' ও 'শ্যাম' রাগের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, সেগুলোর উৎস এই বিষ্ণুপুর ঘরানাই। কারণ তাঁর সংগীতগুরু যদুভট্ট এবং বিষ্ণু চক্রবর্তী উভয়েই এই ঘরানারই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই গায়কি বা শৈলীতে, শিল্পী 'আলাপ'-এর (রাগের প্রারম্ভিক বিস্তার) মাধ্যমে রাগের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলেন। এই শৈলী অত্যন্ত সরল, এতে কোনো গুরুগম্ভীর বা ভারিক্কি অলঙ্কারের বাহুল্য নেই। এটি তালের জটিল ও কুটিল কারিকাজ থেকে মুক্ত। তবে ধামার গায়কির ক্ষেত্রে 'লয়কারী'র প্রয়োগ অনুমোদিত, যা কণ্ঠসংগীতের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। বিষ্ণুপুর ঘরানার 'খেয়াল' তার অত্যন্ত মিষ্টি ও মনোহর সুরের জন্য সুপরিচিত। এটি সংগীতের প্রথাগত অলঙ্কার বা কারুকার্যে সুসজ্জিত থাকে, যা রাগের সুরময় উপস্থাপনায় এক বিশেষ বৈচিত্র্য ও মাধুর্য যোগ করে।

উত্তর ভারতের অন্যান্য ঘরানা যেখানে দ্রুত তান ও জটিল লয়কারীর মাধ্যমে দরবারী জাঁকজমক প্রদর্শনকে প্রাধান্য দিত, সেখানে বিষ্ণুপুর ঘরানা গড়ে উঠেছিল এক সংযত, ধীর এবং আধ্যাত্মিক ভাবগাম্ভীর্যকে কেন্দ্র করে। উত্তর ভারতে যখন 'খেয়াল' গানের জোয়ার শুরু হয়েছে, বিষ্ণুপুরের শিল্পীরা তখনও ধ্রুপদ ও ধামার শৈলীর বিশুদ্ধতা কঠোরভাবে বজায় রেখেছিলেন। এই গায়নশৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

সংযত আলাপ : জটিল ও অতিরিক্ত অলংকরণ (যেমন গিটকিরি বা তান) বর্জন করে রাগের মূল রূপটিকে শান্ত ও গম্ভীরভাবে প্রকাশ করা।

বাণীর গুরুত্ব : বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদে সুরের মারপ্যাঁচের চেয়ে গানের 'বাণী' বা লিরিকের স্পষ্ট উচ্চারণের ওপর জোর দেওয়া হত।

ভক্তিরসের সঞ্চার : মল্ল রাজাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অনুসরণের কারণে এই সঙ্গীত মূলত ঈশ্বর আরাধনার মাধ্যম বা 'ভক্তি রস' উদ্রেককারী হিসেবে ব্যবহৃত হত, যা ছিল আমোদ-প্রমোদের ঊর্ধ্বে।

রাগের নিজস্ব চলন : এই ঘরানায় কিছু কিছু রাগের নিজস্ব রূপ ও স্বরবিন্যাস তৈরি হয়েছিল। যেমন— পুরবী (পূর্বী), সোহিনী, ভৈরব বা বিভাস রাগের ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরের নিজস্ব কিছু সূক্ষ্ম শ্রুতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিষ্ণুপুর ঘরানার 'ধ্রুপদ' গায়কি রূঢ়ি অনুযায়ী— 'বসন্ত' রাগে 'শুদ্ধ ধৈবত' স্বরের প্রয়োগ ঘটায় এবং 'ভৈরব' রাগের অবরোহী (নিচের দিকের) স্বরগুলিতে 'কোমল নিষাদ'-এর মৃদু স্পর্শ ব্যবহার করে। এই ঘরানা 'রামকেলি' রাগে 'কড়ি মধ্যম' স্বরকে বর্জন করেছে, অন্যদিকে 'পূর্বী' ও 'ললিতা' রাগে 'শুদ্ধ ধৈবত' এবং 'বিহাগ' রাগে 'কোমল নিষাদ' স্বরের প্রয়োগের প্রস্তাবনা রেখেছে। তালের বা লয়ের বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও এই ঘরানা নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও রীতি গড়ে তুলেছে। হিন্দুস্তানি সংগীতে 'সওয়াল-জবাব' (প্রশ্নোত্তরমূলক বা দ্বান্দ্বিক পরিবেশনা) প্রথার প্রবর্তন এই বিষ্ণুপুর ঘরানার মাধ্যমেই হয়েছিল।[১৬]

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে ঘরানাগুলি সাধারণত ছিল অত্যন্ত অনুদার ও বংশানুক্রমিক। ওস্তাদরা তাঁদের গুরুমুখী বিদ্যা কেবল নিজেদের সন্তান বা অতি বিশ্বস্ত বৃত্তের বাইরে প্রকাশ করতেন না। বিষ্ণুপুর ঘরানা এই প্রথা ভেঙে এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। মল্ল রাজাদের অর্থানুকূল্যে বিষ্ণুপুরের রাজদরবারে সঙ্গীত শিক্ষা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। জাত-পাত বা পারিবারিক পরিচয় নির্বিশেষে যেকোনো আগ্রহী শিক্ষার্থী রাজকীয় পণ্ডিতদের কাছ থেকে নিখরচায় গান শেখার সুযোগ পেতেন। এই প্রাতিষ্ঠানিক উদারতার কারণে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রাজদরবারের প্রাচীর টপকে বাংলার উদীয়মান মধ্যবিত্ত (ভদ্রলোক) সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার অংশ হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে এই ঘরানার হাত ধরেই ব্রজবুলী বা হিন্দির পাশাপাশি বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ ও খেয়াল রচনার ধারা গতি পায়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 76
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 680 - 689
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিষ্ণুপুর ঘরানার সঙ্গীতশিল্পীরা একসময় সমগ্র বাংলা এবং ভারতের একবিশাল অংশের ওপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের অসামান্য অবদান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তাঁরাই বাংলার গানকে একটি নতুন রূপ ও মাত্রা প্রদান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পরবর্তীকালের অন্যান্য সঙ্গীত শিল্পীরা বাংলা গানকে সঙ্গীত জগতের যে উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল বিষ্ণুপুরেই। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে, মানুষের মন থেকে বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রভাব ক্রমশ ম্লান হয়ে আসতে শুরু করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, বিষ্ণুপুর ঘরানার উদ্ভব ও বিকাশ শুধুমাত্র বাংলার সঙ্গীত ইতিহাসের একটি অধ্যায় নয়, এটি ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় ও নান্দনিক আধুনিকায়নের এক যুগান্তকারী সন্ধিক্ষণ। দিল্লির মোগল দরবারের অবক্ষয় এবং মল্ল রাজাদের দূরদর্শী পৃষ্ঠপোষকতার মেলবন্ধনে যে ধারার সূচনা হয়েছিল তা পরবর্তীকালে নিজস্ব ভৌগোলিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যে অনন্য হয়ে ওঠে। উত্তর ভারতের ঘরানাগুলির রক্ষণশীল ও বংশানুক্রমিক খোলস ভেঙে বিষ্ণুপুরই প্রথম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে এবং সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব গণতন্ত্রীকরণ ঘটায়। বিষ্ণুপুরের এই ঐতিহাসিক যাত্রার সবচেয়ে মধুর ফসল ফলিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই ঘরানার ধ্রুপদী সংযম, রাগের বিশুদ্ধতা এবং বাণীর প্রাধান্যকে অবলম্বন করেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশাল সাম্রাজ্য। বাহ্যিক জাঁকজমক বা যান্ত্রিক কণ্ঠ-কসরত নয়, বরং সুর ও বাণীর অন্তলীন আধ্যাত্মিক সংযোগই যে প্রকৃত সঙ্গীতের শেষ কথা তা বিষ্ণুপুর ঘরানা প্রমাণ করে গেছে। আজ হয়তো সময়ের নিয়মে দরবারী পরিবেশ বিলুপ্ত, কিন্তু বাঙালির মনন, চিন্তন এবং আধুনিক গানের সুরের গভীরে বিষ্ণুপুর ঘরানার ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার চিরকাল অম্লান ও জীবন্ত থাকবে। আর সেই জীবন্ত সাংস্কৃতিক পরিচয়কে যেন আজও ধারণ করে আছে লোকমুখে প্রচলিত পঙ্‌ক্তিটি —

"গান, বাজনা, মতিচুর
এই তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর।"[১৭]

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ, "বিষ্ণুপুর ঘরানা : উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও পরিণতির কথা", শিল্প ও সংস্কৃতি - বাঁকুড়া, দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১০৩–৪
২. https://manasukhdhvani.com/dhrupad-khayal-soul-classical-music-evolution accessed 20 July. 2026
৩. তদেব, পৃ. ১০৫
৪. তদেব, পৃ. ১০৮
৫. https://manasukhdhvani.com/dhrupad-khayal-soul-classical-music-evolution accessed 20 July. 2026
৬. https://en.wikipedia.org/wiki/Vishnupur-gharana, accessed 25 Sept. 2026
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপ্রসন্ন, সংগীত-মঞ্জরী, কলিকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৭৭
৮. চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১০৮
৯. তদেব, পৃ. ১০৫-৬
১০. https://mitanag.com/adver/106803bishnupur-gharana.html, accessed 6 May. 2026
১১. চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১০৯
১২. সিংহ ঠাকুর, দেবব্রত, রবীন্দ্র সংগীতে বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রভাব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, পৃ. ১০-১২
১৩. https://mitanag.com/adver/106803bishnupur-gharana.html, accessed 6 May. 2026
১৪. https://en.wikipedia.org/wiki/Vishnupur-gharana, accessed 25 Sept. 2026
১৫. https://en.wikipedia.org/wiki/Vishnupur-gharana, accessed 25 Sept. 2026

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 76
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 680 - 689
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৬. Rajguru, Joyesh. "Bishnupur Gharana Musical Journey - A Retrospective Study of The Intangible Heritage." Journal of Survey in Fisheries Sciences, Mar. 2023, pp. 507–09
১৭. চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১১১

Bibliography:

বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।
প্রজ্ঞানন্দ, স্বামী, ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস (১ম খণ্ড), শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৬১।
মুখোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার, ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস, এ মুখার্জী এন্ড সনস্, কলকাতা।
সিংহ ঠাকুর, দেবব্রত, বিষ্ণুপুর ঘরানার উৎপত্তির ইতিহাস, ভৈরবী, বাঁকুড়া।
https://www.bishnupurwb.in/musical, accessed 4 May. 2026
https://alchetron.com/Bishnupur-gharana, accessed 4 May. 2026
https://youngintach.org/files/bishnupur-gharana.pdf, accessed 4 May. 2026